উনিশ শতকের বিস্মৃত ব্যক্তি অক্ষয়কুমার দত্ত: চিন্তা ও ভাবনার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। সেইসকল ব্যক্তিবর্গের চিন্তা, কার্যাদি আমাদের প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে । কিন্তু এটাও বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের কাছে উপেক্ষিত, অবহেলিত রয়ে গেছেন । তাঁদের চিন্তা, কার্যাদি আমাদের কাছে অনালোচিত রয়ে গেছে যা অভিপ্রেত ছিল না । আমরা সত্যিই কজন অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা, কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত ? এই বছরে অক্ষয়কুমার দত্তর জন্মের ২০০ বছর পূর্তি হলো । তাঁকে কেন্দ্র করে কটা সেমিনার, কটা আলোচনাসভা হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 'ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ' পাঠদান করা হয় । আমি যতদূর জানি , কেবলমাত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরে অক্ষয়কুমার দত্তর চিন্তা সম্পর্কে পাঠদান করা হয় । প্রসংগক্রমে বলি যে , যদি আমার জানাটা ভুল হয় অর্থাৎ আরো একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা পড়ানো হয় তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হব। আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তর চিন্তা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আমার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই। একসময় রবীন্দ্রভারতীতে পাঠদানকালে আমি যতটুকু বুঝেছি সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম অক্ষয়কুমার দত্ত । যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অন্যতম পথপ্রদর্শক বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না । অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুজনে সমসাময়িক। বিদ্যাসাগরের তুলনায় সামান্য বড়ো অক্ষয়কুমার দত্ত । কিন্তু বিদ্যাসাগরের থেকে অক্ষয়কুমার পাঁচ বছর আগে প্রয়াত হন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। তাঁদের এই বন্ধুত্ব আরেক দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় । সেই দুজন হলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। যাক এই প্রসংগ। আমি এখানে বিদ্যাসাগর মশাই ও অক্ষয়কুমারের সম্পর্ক আলোচনা করছি না। এই প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানভাবনা ও তার সমাজভাবনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতে আগ্রহী ।

Society Language and Culture

বর্ধমানের চুপী গ্রামে ১৮২০ সাধারণ অব্দের ১৫ই জুলাই পিতাম্বর ও দয়াময়ীর সন্তান অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন পিতাম্বর ও দয়াময়ীর চতুর্থ সন্তান। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, পিতাম্বর ও দয়াময়ীর পূর্বের সন্তানরা অকালেই মারা যান। ফলে অক্ষয়কুমার ছিলেন তাদের একমাত্র জীবিত সন্তান। অক্ষয়কুমারের পিতা প্রথমদিকে পুলিশ কার্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন পরবর্তীতে তিনি সাব-ইনসপেকটর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের মা দয়াময়ী একজন পরোপকারী ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন । তিনি গ্রামের অসুস্থ লোকদের যেমন ওষুধ বিতরণ করতেন তেমনি তাদের পথ্যও দিতেন। অক্ষয়কুমার খুব অল্পবয়সে পিতৃহারা হন।

তাঁর ছেলেবেলা চুপীগ্রামে কাটে । গ্রামের পাঠশালাতে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় । তিনি সাত বছর বয়সে পাঠশালায় যান । পাঠশালার পর্ব সাঙ্গ হলে ঐ সময় তিনি পারসী ভাষা শেখেন। সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর মনে অনন্ত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটে। পড়াশুনার পাশাপাশি সেই সময় থেকে গ্রামের বনেজঙ্গলে ঘুরে ও গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের মানুষের সাথে মিশে বাহ্যবস্তু ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় । পাঠশালার পাঠ শেষ করে অক্ষয়কুমার যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স নয় দশ বছর। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি খিদিরপুরে তাঁর জ্যাঠার ছেলে হরিমোহন দত্তর বাড়ীতে থাকতেন । পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিসতোতো ভাই রামধন বসুর দর্জিপাড়ার বাড়ীতে থাকেন। তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে একটু বেশী বয়সে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফললাভ করায় তৎকালীন নিয়মানুসারে ‘ ডবল প্রমোশন ‘ পেয়ে তিনি অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়াতে পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে , তাঁর জ্যাঠার ছেলে অক্ষয়কুমারের পড়াশুনায় যাতে ছেদ না পড়ে তার জন্য দায়িত্ব গ্রহন করতে রাজী ছিলেন এমনকি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর জন্য অবৈতনিক ব্যবস্থার কথা জানান কিন্তু অক্ষয়কুমারের মা চেয়েছিলেন যে , পরনির্ভরশীল না হয়ে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে উঠুন । তারই ফলে অক্ষয়কুমারের প্রথাগত শিক্ষাচর্চায় ছেদ পড়ে। প্রথাগত শিক্ষাচর্চায় ছেদ পড়লেও তাঁর জ্ঞানপিপাসার চর্চা রুদ্ধ হয় না। তিনি প্রথাবহির্ভূতভাবে শিক্ষাচর্চা করতে থাকেন এবং এইক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে তিনি সাহায্যলাভ করেন। তিনি হার্ডম্যানজেফ্রয়ের থেকে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য পাঠ করতেন। ইলিয়ডের ও ভার্জিলের ইনিডের ইংরেজী অনুবাদ পড়েন। আর এইসবের মাধ্যমে পৌত্তিকলতার প্রতি বিশ্বাসের

Society Language and Culture

পরিবর্তে তাঁর মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব প্রোথিত হতে শুরু করে। এর পাশাপাশি তিনি পড়লেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল। তিনি শিখলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি , ত্রিকোণমিতি ও কনিক সেকশন । আয়ত্ত করলেন ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস। অক্ষয়কুমারকে গণিতচর্চায় সাহায্য করলেন রাধাকান্ত দেবের জামাই শ্রীনাথ ঘোষ ও তাঁর দৌহিত্র আনন্দকুমার বসু । এদের সাথে অমৃতলাল মিত্র । পরে তিনি মেডিকেল কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে পাঠ নেন। তিনি বেকনের দর্শনচর্চায় রত হন। এইভাবে নানা বিষয়ানুশীলনের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে ওঠে যা তাঁর পরবর্তী জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

১৮৩৮ সালে অক্ষয়কুমারের সাথে সংবাদ প্রভাকর প্ত্রিকার সম্পাদক তথা ' গুপ্তকবি ' নামে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সাথে পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের মাধ্যম ছিলেন হরিমোহন দত্ত। অক্ষয়কুমার ঈশ্বরগুপ্তের সাথে নানা সভাতে যেতেন। তিনি প্রথমে পদ্য লিখতেন ।তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম অনঙ্গমোহন । ঈশ্বরগুপ্তের উৎসাহে প্রথমে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় একটি ইংরেজী লেখার অনুবাদ করেন এবং ঈশ্বরগুপ্ত সেই অনুবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন । এরপর তিনি ঈশ্বরগুপ্তের অনুরোধে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এর মাধ্যমে তাঁর গদ্যচর্চা শুরু হয়। অনেকে তাঁকে বাংলাগদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বলে অভিভিত করেন ।

তৎকালীন সময়ের আরেক নক্ষত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে ঈশ্বরগুপ্তের মাধ্যমে । ১৮৩৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ' তত্ত্ববোধিনী সভা ' স্থাপিত করেন। ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় অক্ষয়কুমারকে ঐ সভাতে নিয়ে যেতেন। ঈশ্বরগুপ্তের সুপারিশে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হন । প্রসংগ ক্রমে বলা যায় যে, এই সভার সদস্যরা প্রত্যেকেই উনিশ শতকের মধ্যভাগের সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । এটাও উল্লেখ্য যে, তত্ত্ববোধিনী সভা তৎকালীন সময়ের অন্যান্য সভার থেকে পৃথক ছিল। এই সভা কেবলমাত্র আলোচনা, তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচী রূপায়নের চেষ্টা করতেন। এই সভার সংগে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যাঁরা বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন, অক্ষয়কুমারের সাথে এঁদের পরিচয় ঘটে। এখানেই অক্ষয়কুমারের সাথে পরিচয় ঘটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগে এবং তাদের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যা আমৃত্যু অটুট ছিল। এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয়ও আমাদের খেয়াল

Society Language and Culture

রাখতে হবে। সেটি হল যে, অক্ষয়কুমার যখন সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন সেই মুহূর্তে রামমোহন রায় যিনি নবজাগরণের পথিকৃৎ তিনি প্রয়াত হয়েছেন এবং ডিরোজিও পন্থী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন । তত্ত্ববোধিনী সভা যে সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে ১৮৪০ সালে গঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা । অক্ষয়কুমার এই পাঠশালয়ে শিক্ষক রূপে যোগ দেন। তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মাতৃভাষায় লিখিত উপযুক্ত বই ছিল না । তিনি বই রচনার কাজে হাত দিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ ভূগোল। ১৮৪১ সালে বইটি প্রকাশিত হয় । তত্ত্ববোধিনী সভা এই বইটি প্রকাশ করে। বইটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অক্ষয়কুমারের উদ্যোগে শুরু হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে ,বর্তমান সময়ে আমরা যখন ইংরাজী মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার গুণগান করি তৎকালীন সময়ে অক্ষয়কুমার বিপরীত পথে হেঁটে ছিলেন। তাঁর চিন্তায় অনুসরণ করতে পারলাম না।

আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে যুক্তিসংগত চিন্তাভাবনা যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন । ১৮৪২ সালে তিনি ' বিদ্যাদর্শন ' পত্রিকা প্রকাশ করেন । এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। ১৮৪৩ সালে ১৬ ই আগষ্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকার সম্পাদক হন অক্ষয়কুমার। দীর্ঘ বারো বছর তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য যদিও ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক আর্দশ প্রচার করা কিন্তু অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাকে কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যের বৃত্তে সীমায়িত না রেখে জ্ঞান বিজ্ঞান ,সাহিত্য , সমাজবিদ্যা , দর্শন ইত্যাদি চর্চার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেন। প্রসংগক্রমে এখানে এটা বলা যায় যে, তিনি ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি । তাঁর চিন্তায় আমরা ইংরেজ দার্শনিক বেকন ও জনস্টুয়ার্ট মিলের বস্তুবাদী চিন্তা, স্কটিশ চিন্তাবিদ জর্জকুম্বে সহ দৃষ্টবাদী চিন্তাধারার পথিকৃৎ কোঁত এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, তত্ত্ববোধিনী সভাতে পারস্পরিক দুটি ভিন্ন মতের ও পথের সন্ধান দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটি মতের মধ্যে সংঘাতও পরিলক্ষিত হয় । এই দুই মতের একদিকে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন আর অন্য দিকে ছিলেন অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর

Society Language and Culture

মহাশয় যারা ছিলেন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। এই দুই মতের দ্বন্দ্বের ছাপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার স্বয়ং অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু এই পত্রিকায় যেভাবে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন তা অতুলনীয়। প্রসংগতঃ বলা যায় যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের শুরুর সময় থেকে বেশ অনেক সংখ্যাতে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সেখানে থাকতো না। কিন্তু পত্রিকার ৪৭ তম সংখ্যা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। বলা যায় যে, অক্ষয়কুমারের হাত ধরে বাংলাবিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়।

তাঁর বস্তুবাদী চিন্তার কারণে পরর্বতীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে মতবিরোধ ঘটে। তাঁরই পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই যে , অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে বহিস্কৃত করা হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাথে অক্ষয়কুমারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন নিখাদ যুক্তিবাদী, যা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিদের মনপছন্দ নয়। বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এই দ্বন্দ্ব পাঠকদের সামনে উপস্থিত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করছি। তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে মার্চ মাসে যে চিঠি লেখেন তাতে বলেন "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিস্কৃত না করিয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাথে অক্ষয়কুমারের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ঐ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কমে যায় তা তথ্য থেকে জানা যায়।

অক্ষয়কুমার অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন ও পুস্তক রচনা করেন। তত্ত্ববোধিনীতে তিনি প্রাণীবিষয়ক বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করেন সিন্ধুঘোটক নামক রচনার মাধ্যমে। অক্ষয়কুমার প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৮৪৩ সালে যখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্বোধন হয় তখন তিনি সেখানে বাংলাভাষার বক্তৃতা করেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকীয়র পাশাপাশি নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অন্যতম প্রবন্ধ ' ভারতবর্ষীয় লোকের সুজাতীয় ভাষানুশীলন '। এই প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষা সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থিত করেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মনে হয় তাঁর কথাগুলি আজও

Society Language and Culture

সমভাবে প্রাসঙ্গিক। " আমাদিগের দেশভাষার অনুশীলনের প্রতি যে সকল ইংলন্ডীয় লোক পূর্বপক্ষ করেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্বোক্ত যুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমাদিরকে স্বদেশস্থ ইংলন্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে, " সেই বাঞ্ছিত কাল কোন দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরেজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে। " হায়! ইংলন্ডীয় ভাষার বিদ্যাভাসে ছাত্রদের বুদ্ধির প্রাখুর্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে । তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য বিদ্যাশিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন , যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরেজী কথনাদির দ্বারা এরূপ ছল করেন যে ইংরেজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে অপেক্ষার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগ্য বোধ করেন না।" কি আশ্চর্য ! আজও কথাগুলো প্রাসঙ্গিক । আমরা মুখে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে সেই ইংরেজী কথনকে গ্রহণ করি নিজেদের জীবনচর্চায়।

অক্ষয়কুমার নানা প্রবন্ধের পাশাপাশি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সমন্ধ বিচার, তিনটি ভাগ সমন্বিত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, দুটিভাগে সমন্বিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ইত্যাদি। অক্ষয়কুমারের নানা লেখার মধ্যে দিয়ে যুক্তিবাদী মানসিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে দু একটি বিষয় কেবল উল্লেখ করবো।

অক্ষয়কুমার ছিলেন আদ্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ।তাঁর ছিল অনুসন্ধিৎসু মনোভাব। প্রখর বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনার দ্বারা তিনি প্রকৃত সত্য অর্জনেপ্রয়াসী হন।তাঁর চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বেকনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ বাহ্যবস্তু র সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও দুটি খণ্ডে লিখিত ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় এর মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। তিনি কোনো কিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করতেন না। তিনি মনে করতেন যে, যুক্তিবাদী মননির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে উদঘাটিত করতে পারে এবং প্রকৃতির জ্ঞান থেকে মানুষের পক্ষে সঠিক জ্ঞানতত্ত্বে পৌঁছানো সম্ভব। তাঁরভাষায় "বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।" তিনি কখনো অন্ধবিশ্বাস কে সমর্থন করতেন না।

Society Language and Culture

দৈনন্দিন জীবনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত জীবনে অভ্যস্ত আমরা মুখে বিজ্ঞানের কথা বললেও আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা সমাজ ও পরিবারের দোহাই দিয়ে অনেক সময় প্রচলিত সংস্কার ,বিশ্বাস কে মেনে চলি।কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন একদম বিপরীত মেরুর লোক। তিনি কখনই বারবেলা,কালরাত্রি, এই সকল বিষয়গুলোকে মানতেন না। তাঁর কাছে বিজ্ঞান সকল বিধিব্যবস্থার মানদন্ড রূপে বিবেচিত হতো।। তাঁরএই বিজ্ঞান চেতনা নির্ভর মানসিকতা তাঁর লেখনীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁর বহু চর্চিত সমীকরণটা এক্ষেত্রে উল্লেখ করলাম।। পরিশ্রম=শস্য পরিশ্রম+প্রার্থনা=শস্য। প্রার্থনা=শূন্য।। এই সমীকরণের মাধ্যমে এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে,শুধু প্রার্থনা তে কিছু লাভ করা যায় না। পরিশ্রমের মাধম্যে আমরা সব কিছু অর্জন করি। এখানে উনি অযৌক্তিক ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।। ওনার জীবনের শেষ দিকের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। এটি দুটিখণ্ডে লেখা। প্রথম খন্ডটি ১৮৭০সালে আর দ্বিতীয় খন্ডটি ১৮৮৩সালে প্রকাশিত হয়। এইখানে আমরা তার ধর্ম বিযুক্ত বিজ্ঞানচিন্তার সন্ধান পাই।

যুক্তিবাদী ,বিজ্ঞানমনস্ক ও সংস্কারমুক্ত এই মহান মনীষী ১৮৮৬ সালে ২৮ শে মে প্রয়াত হন। এই মহান মনীষী যে যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানভাবনায় চালিত হয়েছিলেন আজ এক অস্থির সময়ে আমরা যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই ভাবনার দ্বারা নিজেদেরকে চালিত করতে পারি তাহলে তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

ঋণ স্বীকার: এই লেখাটা লেখার জন্য যে সকল গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি আমি সেই সকল গ্রন্থের ও পত্রিকার লেখকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য সূত্র :

১) বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয় কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ:-
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম।
২) অক্ষয়কুমার দত্ত:আঁধার রাতে একলা পথিক:- আশীষ লাহিড়ী।
৩) দ্বিশতজন্মবর্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত:- কোরক সাহিত্য পত্রিকা।
৪) বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।